প্রথম আলো
রোববার, ২০ নভেম্বর ২০১১

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ■ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সংকট উত্তরণে প্রয়োজন বিশেষ ও জরুরি কর্মসূচি

বাংলাদেশের মতো একটি স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতি পরিচালনা করার কাজটি নিঃসন্দেহে কঠিন। কিছু কাঠামোগত সমস্যা ধারাবাহিকভাবে বিরাজমান রয়েছে। সরকারের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। আমাদের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বিনিয়োগ-চাহিদার তুলনায় কম। রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি। এখনো বিপুল জনগোষ্ঠী কৃষির ওপর নির্ভরশীল। রয়েছে জ্বালানির সংকট। এর বাইরে বিশ্ব অর্থনীতির ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্ভরশীলতা তো রয়েছেই। এত কিছুর পরও বিগত দশকগুলোতে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। কমেছে দারিদ্র্যের হার। আর্থসামাজিক বিভিন্ন খাতেও উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এসব উন্নতি খুবই দুর্বল কাঠামোগত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা যথোপযুক্তভাবে পরিচালিত না হলে অর্থনীতি দ্রুতই সমস্যার মধ্যে পড়ে যায়।

ঝুঁকি বাড়ছে

২০১১ সালের প্রথম দিক থেকে অর্থাৎ গত অর্থবছরের দ্বিতীয় ভাগ থেকে আমাদের অর্থনীতিতে কিছু নেতিবাচক দিক লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে এগুলো হচ্ছে: অব্যাহত মূল্যস্ফীতি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন দ্রুত না হওয়া, ভর্তুকি অর্থায়নের চাপ, স্বল্প বৈদেশিক সাহায্য, পুঁজিবাজারে ধস ও করবহির্ভূত রাজস্ব কম আদায়। এসব সমস্যার পরও অবশ্য গত অর্থবছর মোটামুটি ভালো রাজস্ব আদায়, দৃষ্টিকাড়া রপ্তানি বৃদ্ধি, জনশক্তি রপ্তানিতে ঘুরে দাঁড়ানোসহ ৬.৭ শতাংশ (প্রাথমিক প্রাক্কলন) প্রবৃদ্ধি নিয়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি, এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েও গত চার মাসে অর্থনীতির নেতিবাচক দিকগুলো আরও গভীর ও জটিল হয়েছে।

প্রথমত, বিশ্ব অর্থনীতি পুনরায় মন্দার দিকে যাচ্ছে। মার্কিন ও ইউরো অঞ্চলসহ অন্য উন্নত দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধি কমছে। সরকারের দায় বেড়েছে, কর্মসংস্থান কমার কারণে বেকারত্ব বেড়েছে। এমনকি সেসব অঞ্চলে দরিদ্র লোকের সংখ্যাও বাড়ছে। একই সঙ্গে খাদ্য ও জ্বালানিসহ প্রাথমিক পণ্যমূল্য উঁচু পর্যায়ে রয়েছে। এসব কারণে আমাদের রপ্তানি ও অনাবাসী শ্রমিক খাত, বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তি, বিদেশি বিনিয়োগ—সবই সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে ২০০৮ সালে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের যে সক্ষমতা ছিল, তা তুলনামূলকভাবে কমে গেছে। মন্দা মোকাবিলায় প্রণোদনামূলক যে ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন পড়ে, সে ক্ষমতা সরকারের নেই। মূল্যস্ফীতির উচ্চমাত্রার কারণে ঋণ করে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া বৈদেশিক লেনদেনে চাপ থাকায় নতুন মন্দা মোকাবিলার শক্তি আরও সীমিত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, বিগত চার মাসে সরকারের আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে। তিন মাসের ব্যয়ের হিসাবে বড় ধরনের ব্যত্যয় লক্ষ করা গেছে। বাজেটের পরিসংখ্যান ও মুদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রাগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সামান্য উন্নয়ন ব্যয়ের বিপরীতে বছরের শুরুতে সরকার বিপুল পরিমাণ ঋণ নেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে—এত অর্থ যাচ্ছে কোথায়? এই অর্থের একটি বড় অংশ ভর্তুকির পেছনে যাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলা যায়, বিশেষ করে ভাড়াটে বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য জ্বালানি আমদানির পেছনে ব্যয় হচ্ছে। আর ব্যাংকগুলো থেকে বেশি ঋণ নেওয়ায় ব্যাংকগুলোর পক্ষে ব্যক্তি খাতে ঋণ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এর ফলে কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থায়, বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাকংগুলোতে আমানত ও ঋণ প্রদানের মধ্যে বড় ধরনের তারতম্য সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আবার বৃহৎ পরিমাণ কুঋণের আশঙ্কা রয়েছে। এটা ব্যাংকিং খাতকে দুর্বল করে দিতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক নীতির যে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা থাকা প্রয়োজন, সে সক্ষমতা লক্ষ করা যাচ্ছে না।

তৃতীয়ত, বৈদেশিক লেনদেনের ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানি আয় বৃদ্ধির হার শ্লথ হয়ে আসছে। আমদানি কমলেও তা উল্লেখযোগ্য হারে কমেনি। জনশক্তি রপ্তানি বেড়েছে, কিন্তু এই খাতে আয় বৃদ্ধির বিষয়টি এখনো লক্ষণীয়ভাবে নিচু। অন্যদিকে বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তি এতটা নিচে নেমে গেছে যে এর ফলে যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তাও খরচ হয়ে যাচ্ছে বৈদেশিক ঋণের দায় পরিশোধ করতে। একইভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ যা আসছে, তা চলে যাচ্ছে ব্যয় পরিশোধ ও মুনাফা রপ্তানির মাধ্যমে। এই সবকিছু মিলিয়ে টাকার বৈদেশিক বিনিময় হার নিম্নমুখী।

চতুর্থত, মূল্যস্ফীতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। এই হার সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই বর্ধিত মূল্যস্ফীতি হয়েছে মূলত খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে। চিন্তার বিষয় হচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যও বাড়ছে। বাড়িভাড়া, পরিবহন, জ্বালানি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে খরচ বেড়েছে। মূল্যস্ফীতি সামনে সামান্য কমলেও তা বছর শেষে ১০ শতাংশের কাছাকাছি থেকে যাবে।

এ ছাড়া বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মতো প্রাথমিক জ্বালানি ক্ষেত্রে সংকট অব্যাহত থাকায় একই সঙ্গে বিনিয়োগ, উৎপাদন-ক্ষমতার ব্যবহার ও নাগরিক জীবন ব্যাহত হচ্ছে। বড় যে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেগুলোর সবকিছু ঠিক থাকলেও ২০১৪ সালের জুনের আগে উৎপাদনে যেতে পারবে না। এর অর্থ হচ্ছে, ব্যয়বহুল ভাড়াটে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর ওপর অন্তত এ সময় পর্যন্ত নির্ভরশীল থাকতেই হচ্ছে।

পরিস্থিতির পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন

বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় সরকারকে দেশের অর্থনীতির জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে তার মনোভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। সরকার যদি বাস্তবতাকে অস্বীকার করে, তবে সমাধানের পথ খুঁজে বের করা কঠিন হবে। সরকারকে মনে রাখতে হবে, নির্বাচনের আর দুই বছর বাকি রয়েছে। এ রকম অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রবণতাগুলো অব্যাহত থাকলে তারা নিঃসন্দেহে একটি দুর্যোগময় অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে নির্বাচনের মুখোমুখি হবে।

> বৈরী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কতিপয় মৌল বিষয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক বোঝাপড়া ও সামাজিক শক্তিগুলোর সঙ্গে পরামর্শ অপরিহার্য। স্বচ্ছতার সঙ্গে বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ দিয়ে জনগণকে আস্থায় নিতে হবে। না হলে স্বল্পমেয়াদি সমস্যা মধ্য মেয়াদে আমাদের সাম্প্রতিক অর্জনগুলোকে দুর্বল করে দিতে পারে

তাই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আগামী দুই বছরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রতি সরকারকে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিতে হবে। সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বিভিন্ন নীতি অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনায় রেখেই একটি দুই বছর মেয়াদি বিশেষ ও জরুরি কর্মসূচি নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই কর্মসূচির আলোকে বার্ষিক বাজেটকে দ্রুত সংশোধন ও পরিমার্জন করতে হবে।

এর জন্য অনেক ক্ষেত্রে দরকার পড়বে তাৎক্ষণিক কিছু প্রয়োজনীয় কিন্তু অজনপ্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ভর্তুকি সমন্বয়ের চেষ্টা হচ্ছে তার একটি। তবে এর পাশাপাশি সরকারকে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কমাতে হবে। অনুন্নয়ন ব্যয়কে অপরিহার্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে খতিয়ে দেখতে হবে। বৈদেশিক সাহায্য অবমুক্ত করার জন্য প্রকল্পভিত্তিক বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। সম্পূর্ণ স্থানীয় অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণ সীমিত রাখতে হবে। রাজস্ব বাড়ানোর জন্য করবহির্ভূত আয় বাড়াতে হবে। মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর লাইসেন্স নবায়ন ফির মাধ্যমে যার কিছুটা আসবে। সঞ্চয়পত্রের সুদ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিক্রি বাড়াতে হবে। তবে সার্বিক বিবেচনায় সরকারি গ্যারান্টির ভিত্তিতে উচ্চ সুদে বন্ডের মাধ্যমে বৈদেশিক ঋণ নেওয়া আদৌ ঠিক হবে না। এ ক্ষেত্রে আর্জেন্টিনার মতো দেশের অভিজ্ঞতা আমরা বিবেচনায় নিতে পারি।

সরকার ভর্তুকি সমন্বয়ের মাধ্যমে যে অর্থ সাশ্রয় করবে, সে অর্থ বেতন-ভাতা খাতে বা সরকারের সুদ পরিশোধে ব্যয় না হয়ে যায়। এই অর্থ বিনিয়োগ খাতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে যেতে হবে। মোট কথা, এই অর্থ স্থানীয় অর্থায়ন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

উচ্চ মূল্যস্ফীতির বিপরীতে দরিদ্র ও অতিদরিদ্রদের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচিকে আরও বেশি কার্যকর ও সম্প্রসারণ করতে হবে। বিশেষ করে নজর দিতে হবে যে দিকগুলোতে সেগুলো হচ্ছে: ১. খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রাখা, ২. সরকারি সংগ্রহব্যবস্থা জোরদার করার মাধ্যমে কৃষকের মূল্য সমর্থন নিশ্চিত করা, ৩. খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা উন্নত করা, ৪. প্রয়োজনে মজুদ পণ্য খোলাবাজারে বিক্রি করে বাজার স্থিতিশীল রাখার উদ্যোগ নেওয়া, ৫. দরিদ্রদের জন্য বিভিন্ন আয় প্রবর্ধক কর্মসূচি নেওয়া।

রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখার বিষয়টি খুবই জরুরি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের রুলস অব অরিজিন সংশোধনের চেষ্টা ও ভারতের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের সুযোগ কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে হবে। অনাবাসী আয়প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বাজার সম্প্রসারণ এবং অভিবাসন ব্যয় কমানোর চেষ্টা আরও ফলপ্রসূ করতে হবে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ তিন মাসের আমদানি ব্যয়ের চেয়ে কমে যাওয়ায় টাকার বিনিময় হারকে নজরদারিতে রাখতে হবে বিচক্ষণতার সঙ্গে। আইএমএফের মতো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ নেওয়ার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে আমরা যেন নীতি প্রণয়নের স্বাধীনতা হারিয়ে না ফেলি।

বাজারব্যবস্থায় সরকারকে অবশ্যই আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। সেটা পণ্য, শ্রম, সেবা, পুঁজি ও অর্থ—সব বাজারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পুঁজিবাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনার কাজটি করতে হবে স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও দেখভালকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। শুধু তারল্য বাড়িয়ে নয়, তবে পুঁজিবাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনার কাজটি কঠিন হবে, কারণ সাম্প্রতিক ধসের জন্য দায়ী হিসেবে বিবেচিতদের কেউ দৃশ্যত কোনো শাস্তি পায়নি। লক্ষ রাখতে হবে, পুঁজিবাজারের সমস্যা ব্যাংকিং খাতে যেন সংক্রামিত না হয়।

বিগত সময়ের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিলে আমরা দেখি যে সরকার প্রায়ই অর্থনৈতিক বিষয়াবলির ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুঁজিবাজার এর বড় উদাহরণ। এ ছাড়া সরকারের মধ্যে প্রাক্‌প্রস্তুতি ও সমন্বয়ের অভাব বিভিন্ন সময় দেখা গেছে। এর উদাহরণ হিসেবে আমরা জ্বালানি খাতের কথা বলতে পারি। আবার অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে যে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় নেতৃত্বমূলক ভূমিকা পালন করতে পারছে না। মন্ত্রণালয়ের অনেক সিদ্ধান্তই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। নতুন ব্যাংকের ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের বিষয়টি এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে অস্বচ্ছ ও আমলাতান্ত্রিকভাবে। সংসদ বা সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো, এমনকি মন্ত্রিপরিষদ অনেক বিষয়ে অন্ধকারেই রয়েছে বলে মনে হয়।

রাজনৈতিক বোঝাপড়া জরুরি

আমাদের অর্থনীতি বর্তমানে যে জটিল ও কঠিন সময় পার করছে, তা থেকে উত্তরণের জন্য যেসব শক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন, সে জন্য অবশ্যই ন্যূনতম রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সামাজিক সমঝোতা নিশ্চিত করা দরকার। এটা করতে সরকারকে যদি কিছু রাজনৈতিক ছাড়ও দিতে হয়, তবু সরকারের সে পথই বেছে নেওয়া উচিত। কারণ চূড়ান্ত বিচারে এতে সরকারই লাভবান হবে।

বর্তমানের এই অনিশ্চিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শুধু বর্তমানের জন্যই নয়, ভবিষ্যতের জন্যও বাড়তি ঝুঁকি সৃষ্টি করবে। দুঃখজনকভাবে রাজনৈতিক বক্তব্যের বাইরে আমরা বিরোধী দলের কাছ থেকেও এই অর্থনৈতিক সমস্যার কোনো চিন্তাশীল মূল্যায়ন পাইনি। এসব সমস্যা সমাধানে তাদের কোনো বিকল্প চিন্তা আছে এমন কিছুও শোনা যায়নি।

সাম্প্রতিক বিশ্ব অভিজ্ঞতা বলছে যে বৈরী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কতিপয় মৌল বিষয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক বোঝাপড়া ও সামাজিক শক্তিগুলোর সঙ্গে পরামর্শ অপরিহার্য। স্বচ্ছতার সঙ্গে বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ দিয়ে জনগণকে আস্থায় নিতে হবে। সেটা করা না হলে একটি উত্তরণকালীন স্বল্পমেয়াদি সমস্যা মধ্য মেয়াদে আমাদের সাম্প্রতিক অর্জনগুলোকে দুর্বল করে দিতে পারে।

● **দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অর্থনীতিবিদ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।**